The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol. 35, 2026 (P. 312-333)

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে 'কমিউনিকেশন' তথা 'যোগাযোগ' প্রত্যয়টির পুনঃপাঠ

সায়মা আলম[১]

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এবং জ্ঞান-চর্চার আদি ক্ষেত্র রূপে পরিচিত ভারতীয় সভ্যতায় জ্ঞান-চর্চা হয়েছে পশ্চিম থেকে অনেকটা ভিন্ন পথে। কিন্তু যোগাযোগ প্রত্যয়ের প্রাচ্যীয় ব্যাখ্যা সেভাবে এখানে পরিচিত হয়নি। বরং 'কমিউনিকেশন'-এর আলোচনা আধুনিক বাংলা বিদ্যায়তনে এসে যুক্ত হওয়ার পর এর অনেকটা আকস্মিক অনুবাদ করা হয়েছে 'যোগাযোগ'। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় যোগাযোগ সংক্রান্ত যত প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পশ্চিমা 'কমিউনিকেশন'-এরই রূপান্তর। 'কমিউনিকেশন'-এর অনুবাদ 'যোগাযোগ' কতটা যৌক্তিক এবং এর সাথে ভারতের জ্ঞানচর্চার আদৌ কোন সংযোগ বা বিরোধ রয়েছে কি না তা খুঁজে দেখা এই নিবন্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

তবে প্রাচ্যে তথা বাংলায় যোগাযোগ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায় না, তারপরও বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি ও গ্রন্থাদি থেকে এখন পর্যন্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনে 'যোগাযোগ' নিয়ে বেশ সমৃদ্ধ আলোচনা আছে। ভারতীয় দর্শন-চিন্তার প্রেক্ষাপটে যোগাযোগের ব্যাখ্যা অনেক গভীর ও তাৎপর্যময়। এখানে যোগাযোগ কেবল এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির তথ্য, ভাব বা বাক্যের আদান-প্রদানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এখানে যোগাযোগকে দেখা হয়েছে এমন এক দর্শন হিসেবে, যা সমগ্র বিশ্বের সকল প্রাণকে সংযুক্ত করে কিভাবে মহাজ্ঞানের হদিস পাওয়া যায়, সে পথের দিকে ইঙ্গিত দেয়।

Key Words: *যোগাযোগ, ভারতীয় যোগাযোগ, প্রাচ্যীয় যোগাযোগ, বাংলার যোগাযোগ দর্শন*

ভূমিকা:

বেঁচে থাকার তাগিদ থেকে মানুষকে যত কাজ করতে হয় তার অন্যতম হলো জগৎ-সংসারের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। এটি সম্ভবত মানুষের সবচেয়ে প্রাথমিক কর্মকাণ্ডের একটি। বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ 'জগতের সাথে সম্পর্ক তৈরির' এই ক্রিয়াকে নিজের জীবনের অংশ করে নিয়েছে, গড়ে তুলেছে সমাজ, নির্মাণ করেছে সভ্যতা। নিজ (আত্ম) থেকে পরিবার, গোত্র, সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা রাজনৈতিক কূটনীতি সর্বত্র এই বিশেষ ক্রিয়ার রয়েছে শক্তিশালী ও স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান।

'জগতের সাথে সম্পর্ক তৈরির' ক্রিয়াকে ভারতীয় অঞ্চলে কী নামে ডাকা হতো তার কোন হদিস এখন পর্যন্ত সেভাবে মেলেনি। তবে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপ ও

---

[১] সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: saima.alam@cu.ac.bd

আমেরিকার একাডেমিতে 'কমিউনিকেশন' নামে নতুন এক বিদ্যা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'কমিউনিকেশন' এর সংজ্ঞা আলোচনা 'জগতের সাথে সম্পর্ক তৈরির' মৌলিক মানবক্রিয়ারই আভাস দেয়।

বিংশ শতকের দুটো বিশ্বযুদ্ধে ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তথ্যের দ্রুত বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা, তথ্যের মাধ্যমে অপরকে প্রভাবিত করা, প্রচারণা বা প্রপাগান্ডা তৈরীর কৌশল ইত্যাদি বিষয় মানুষকে কৌতূহলী করে তুলেছিলো। যুদ্ধে নানা উপায়ে তথ্যকে আকার দেয়া কিংবা যুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে জনমত তৈরি করা বা এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ইত্যাদি সবকিছু মিলে 'কমিউনিকেশন' পশ্চিমের সব বিদ্যায়তনে জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হয়ে ওঠে। (Schramm, The process and effects of mass communication, 1954) (Lasswell, 1927) এবং ৬০-এর দশকের পর জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো 'কমিউনিকেশন'ও বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের বিদ্যায়তনে 'পশ্চিমা জ্ঞান' হিসেবে পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা পায়। (Rogers, 1994) যে কোন বিবেচনায় বর্তমানে 'কমিউনিকেশন' অন্যতম প্রভাবশালী প্রত্যয়। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে, ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে আলোচনাও দিন দিন বেড়ে চলছে।

'কমিউনিকেশন' প্রত্যয়ের আলোচনা অধুনা বাংলাভাষার বিদ্যায়তনে এসে যুক্ত হলে এর অনুবাদ হয়েছে 'যোগাযোগ'। এখন পর্যন্ত বাংলাভাষার বিদ্যায়তনে 'কমিউনিকেশন' প্রত্যয়ের সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রতিশব্দ হচ্ছে 'যোগাযোগ'। কেবল যে শব্দান্তর করা হয়েছে তা নয়, বর্তমানে বাংলা প্রায় সব বিদ্যায়তনে 'যোগাযোগ' সংক্রান্ত সব আলোচনা মূলত 'কমিউনিকেশন' প্রত্যয়রই অনুবাদকৃত আলাপ।[২]

যদিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একটি বিশেষ বিদ্যা-চর্চা হিসেবে 'জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্র্পক তৈরির' বিদ্যা প্রায় সব সভ্যতাতেই উপস্থিত ছিলো। প্রত্যেক সভ্যতা শুরু থেকেই 'সম্পর্ক তৈরির' এই বিদ্যা নিয়ে নিজেদের মতো করে চিন্তা করেছে, ব্যাখ্যা করেছে এবং প্রাত্যহিক কর্মে ব্যবহার করেছে। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিভিন্ন প্রাচীন দর্শন, সাহিত্যে তার প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই।[৩] কিন্তু কাল পরিক্রমায় জানা-অজানা বিচিত্র কারণে 'যোগাযোগ' আজ কেবল পশ্চিমা সভ্যতাতেই নয়, প্রাচ্যে, এমন কি খোদ ভারতবর্ষেও পশ্চিমা ধাঁচেই চর্চিত হচ্ছে। প্রাচ্যে হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত 'যোগাযোগ ভাব'-এর আদি পরিচয় অন্তরালে চলে গেছে। নতুন ছাঁচে, নতুন রূপে, নতুন অর্থে 'কমিউনিকেশন'-এর বাংলা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে 'যোগাযোগ'। এবং এখন পর্যন্ত যোগাযোগ শব্দটি বাংলা

[২] অন্তত যোগাযোগ সংক্রান্ত বই পুস্তকের দিকে তাকালে এমনটাই দেখা যায়

[৩] বিশেষ করে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে যোগাযোগ কী এবং কিভাবে ফলপ্রসূ যোগাযোগ করা হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে

বিদ্যায়তনে কমিউনিকেশনের বাংলা হিসেবে সর্বাধিক প্রচলিত একটি শব্দ। নিজের সঙ্গে নিজের কিংবা অপরের সঙ্গে বাদ, মতবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে জাগতিক সম্পর্ক তৈরীর এ বিদ্যাকে 'যোগাযোগ' নামে চিহ্নিত করে পশ্চিমা আলোকেই আলোচনা চালিয়ে নেয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জ্ঞানচর্চা বলতে বর্তমানের ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশের সমন্বিত প্রাচীন জ্ঞান-চর্চাকেই বোঝানো হচ্ছে।

যোগাযোগ প্রত্যয় পুনঃপাঠের যৌক্তিকতাঃ

'কমিউনিকেশন' অধ্যয়নের উন্মেষ যেহেতু পশ্চিমে, স্বাভাবিকভাবে 'কমিউনিকেশন'-এর সকল আলাপ পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের পর্যবেক্ষণ ঘিরে এগিয়েছে। বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের তাত্ত্বিকগণ 'কমিউনিকেশন'-কে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিয়েছেন, যা ধরা পড়ে, এরিস্টটল থেকে শুরু করে অন্যান্য সব কমিউনিকেশন তাত্ত্বিকদের আলোচনায়। এসব তত্ত্ব আলোচনায় কমিউনিকেশনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য, কাজ এবং হাল আমলে এর বিভিন্ন প্রায়োগিক দিকও উঠে এসেছে। অন্যদিকে, বিশেষ করে, ভারতবর্ষে ঐতিহ্যিকভাবে গড়ে ওঠা 'যোগাযোগ'-এর যে আলোচনা বা চর্চা ছিলো, তা 'কমিউনিকেশন'-এর আদলের নীচে চাপা পড়ে বা হারিয়ে গেছে বলা যায়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে 'কমিউনিকেশন'-এর অনুবাদ 'যোগাযোগ' কতটা যৌক্তিক এবং এর সাথে ভারতের জ্ঞানচর্চার আদৌ কোন সংযোগ বা বিরোধ রয়েছে কি না তা খুঁজে দেখা এই নিবন্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। পাশাপাশি 'কমিউনিকেশন' ও 'যোগাযোগ'-এর মধ্যে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না তা আরেকবার খতিয়ে দেখা এবং সবশেষে ভারতীয় প্রেক্ষাপট থেকে 'যোগাযোগ'-এর স্বরূপ তুলে ধরাও এ লেখার আরেকটি উদ্দেশ্য।

গবেষণার সমস্যা ও উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশসহ বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহে যোগাযোগ অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো পর্যবেক্ষণ[৪] করলে দেখা যায় বাংলায় যোগাযোগ অধ্যয়ন মূলত পশ্চিমের কমিউনিকেশনেরই অনুবাদমাত্র এবং পশ্চিমে বিকাশ লাভ করা যোগাযোগ–মডেলগুলো গ্রহণযোগ্য কাঠামো হিসেবে এখানে বিবেচিত ও অধীত হয়। এই অধ্যায়নে এ অঞ্চল তথা ভারতীয় সভ্যতায় বিকাশ লাভ করা জ্ঞানের কোনো আভাস দেখতে পাওয়া যায় না। যে কারণে এ মাটিতে বিকাশপ্রাপ্ত জ্ঞান মূলধারা থেকে অনেকটাই হারিয়ে গেছে বা তাত্ত্বিক আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে। এ

[৪] বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যোগাযোগ অধ্যয়ন বিভাগের সিলেবাস, এবং তাতে উল্লেখিত রেফারেন্স পুস্তকসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে এমনটাই প্রতীয়মান হয়

প্রবন্ধে সে অনুপস্থিতির কারণ ও যৌক্তিকতাকে পুনরায় খতিয়ে দেখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ গবেষণায় যে বিশেষ সমস্যাকে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো:

১. কমিউনিকেশনের বাংলা যোগাযোগ কতোটা যৌক্তিক হয়েছে তা দেখা;
২. কমিউনিকেশনের পশ্চিমা ধারণার সাথে ভারতের যোগাযোগ সংক্রান্ত ধারণার মিল-অমিল নিরীক্ষা করা;
৩. ভারতীয় প্রেক্ষাপটে 'যোগাযোগ ধারণা'র রূপ-উন্মোচন করা।

কর্মপদ্ধতি:

এই গবেষণা গুণগত নথি বিশ্লেষণ (Qualitative Documentary Analysis) পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে, যেখানে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের বিভিন্ন উৎস থেকে যোগাযোগের দর্শন-তাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসন্ধান করা হয়েছে। গবেষণায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো:

তথ্য সংগ্রহ:

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-দর্শন বলতে ভারতবর্ষের প্রধান ছয়টি দর্শনের (সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মিমাংসা, উত্তর মিমাংসা) কথা সবার আগে আসে। এ গবেষণায় এ ছয়টি দর্শনের মধ্যে বিশেষ করে সাংখ্য ও যোগ দর্শনকে খতিয়ে দেখা হয়েছে। এ দুই দর্শনের পাশাপাশি কিছু প্রাচীন ভারতীয় টেক্সট যেমন ভগবতগীতা, ত্রিপিটিক, জৈনদর্শনের আচারাংগা সূত্র, ভারতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্র ইত্যাদিতে যোগাযোগ বিষয়ক আলোচ্যাংশ এবং ভারতীয়-দর্শন বিষয়ক আধুনিক গবেষণাপত্র, প্রাচ্য ও পশ্চিমের যোগাযোগ বিষয়ক আলোচনাকে এখানে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে–

১. সাংখ্য ও যোগ দর্শনের গ্রন্থ (যেমন পতঞ্জলির যোগসূত্র)
২. ভগবদতগীতা (যোগ-সংক্রান্ত অধ্যায়)
৩. নাট্যশাস্ত্র (ভরতমুনি প্রণীত গ্রন্থের যোগ সংক্রান্ত অধ্যায়)
৪. বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য (ত্রিপিটক, আচারাংগাসূত্র)

এছাড়াও এ গবেষণায় ভারতীয় দর্শন বিষয়ক আধুনিক গবেষণাপত্র ও বই এবং পশ্চিমা ও প্রাচ্যের যোগাযোগ তত্ত্বসমূহ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২. তথ্য বিশ্লেষণ

এখানে যোগাযোগ এবং এর সাথে সম্পর্কিত ধারণাসমূহ চিহ্নিতকরণ (যেমন: যোগ, বাক, সম্পর্ক-তৈরী, সংশ্লেষ) এর জন্য 'বিষয় ভিত্তিক বিশ্লেষণ' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বিশেষ করে সংস্কৃত ও পালি শব্দের প্রাসঙ্গিক অর্থ ও দার্শনিক তাৎপর্য উদঘাটনের জন্য 'ব্যাখ্যামূলক পাঠ বিশ্লেষণ' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও যোগাযোগের ভারতীয় ধারণার সাথে পশ্চিমা ধারণা মিলিয়ে দেখার জন্য প্রাচ্য (এন এম আধিকারি'র সাধারণিকরণ মডেল) ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগ মডেলের (যেমন Shannon-Weaver, W. Schramm) মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনাঃ

যোগাযোগ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যে আলোচনা পাওয়া যায় তার প্রায় পুরোটাই পশ্চিমা যোগাযোগ ধারণার উপর ভিত্তি করে। বাংলায় কিংবা প্রাচ্যে এ সংক্রান্ত গবেষণা খুব কম বা নেই বললেই চলে। যদিও সীমিত পরিসরে কিছু গবেষণা হয়েছে যা এ আলোচনায় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

বিশিষ্ট ভারতীয় পণ্ডিত যাস্ক তাঁর 'নিরুক্ত' গ্রন্থে শব্দ, অর্থ ও ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মূলত যোগাযোগেরই এক প্রাচীন ধারণা নির্মাণ করেছেন। তার মতে ভাষা কেবল বাহ্যিক প্রকাশ নয়, বরং তা স্মৃতি, উপলব্ধি ও সংস্কারের ধারক যা ভারতীয় দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Yāska, trans. Sarup, 1998)।

নেপালী গবেষক নির্মলা মণি অধিকারী তার গবেষণায় সংস্কৃত ভাষা, ধ্বনি ও শব্দতত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানতাত্ত্বিক পটভূমিতে যোগাযোগ প্রত্যয়ের গভীর তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে প্রাচীন ভারতে ভাষাকে কেবল যোগাযোগের বাহন হিসেবে নয়, বরং এক জ্ঞানতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে দেখা হতো তা তিনি তাঁর গবেষণায় তুলে ধরেছেন। তিনি Communication Theory and Classical Sanskrit Text শীর্ষক গবেষণায় যোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের গুরুত্ব চিহ্নিত করার পাশাপাশি তা থেকে নতুন ভাবনার পথও উন্মুক্ত করেন (Adhikary, 2013)। পশ্চিমা চিন্তার সাথে ভারতীয় ও হিন্দু সাহিত্য প্রেক্ষাপট থেকে যোগাযোগ বোঝার চেষ্টা করেছেন তিনি। এশীয় ও হিন্দু চিন্তাধারাও এখন এই আলোচনায় জায়গা করে নিচ্ছে বলে তিনি জোর সুপারিশ ব্যক্ত করেছেন (Adhikary, 2013)।

নির্মলা মণি অধিকারীর The Bhatta Mimamsa Model of Communication: An Overview শীর্ষক গবেষণায় 'ভট্ট মিমামসা' নামে যোগাযোগের একটি ভারতীয় মডেল আলোচনা করেছেন। এই মডেলটি মূলত তাঁর ২০১২ সালের পিএইচডি গবেষণার ফলাফল, যেখানে তিনি মীমাংসা দর্শনের প্রমাণ (Pramana), প্রামেয় (Prameya), অভিহিত্যায়নবা (Abhihitanvayavada), এবং ভাবনাতত্ত্ব (Bhavana Theory) ইত্যাদি ধারণাগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগকে

বিশ্লেষণ করেছেন । এই মডেলে যোগাযোগের **১১**টি উপাদান চিহ্নিত করে যোগাযোগকে প্রাচ্যীয় তথা ভারতীয় প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনা করেছেন (Adhikary, 2012) ।

যোগাযোগ মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাযোগ আলোচনায় বৌদ্ধ দর্শনের তাৎপর্য তুলে সে আলোকে যোগাযোগের মূল বিষয় বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন সায়ন্তনী রায় এবং সুমিত নারুলা। গবেষকদ্বয় পশ্চিমা ব্যাখ্যার বিপরীতে ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে যোগাযোগ-ভাবনার নতুন ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন। তারা এখানে বয়ান বিশ্লেষণ (Discourse analysis) পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন (Roy and Narula, 2017)।

An introduction to sadharanikaran model of communication শীর্ষক প্রবন্ধে নির্মলা মণি অধিকারী আরেকটি ভারতীয় যোগাযোগ মডেল বর্ণনা করেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন ‘সাধারনীকরণ মডেল’। তার এই তত্ত্ব বা মডেলের কেন্দ্রীয় ধারণা হলো ‘সহৃদয়তা’ অর্থাৎ প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে মানসিক অভিন্নতা বা অভিজ্ঞতাগত মিল। তাঁর মতে এই অভিন্নতার মধ্য দিয়েই প্রকৃত ‘একত্রীকরণ’ সম্ভব হয়। সমাজে ভিন্নতার মধ্যেও যদি প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও হৃদ্যতা গড়ে ওঠে, তবে সেই যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে ‘সাধারণীকরণ’ বলা যায়। এবং এর মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পন্ন হয়। এই মডেলে ‘সহৃদয়’ বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে যারা বার্তা পাঠানো ও গ্রহণের জন্য যোগ্য এবং একে অপরকে প্রেরক ও গ্রাহক হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম (Adhikari, 2010)।

কমিউনিকেশন সম্পর্কিত এ যাবতকালীন প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনাঃ

কমিউনিকেশন বলতে এ পর্যন্ত কেবল কমিউনিকেশনের পশ্চিমা রূপ মূলধারার আলোচনায় উঠে এসেছে। এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ বিদ্যায়তনে এর চর্চা এ রূপকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। তাই কমিউনিকেশনের মূলধারার প্রধান এ রূপ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা ছাড়া কমিউনিকেশন বোঝা বা আলোচ্য যোগাযোগ বিষয়টির গভীরে প্রবেশ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পশ্চিমা ‘কমিউনিকেশন’

প্রত্যয়টির সার কথা

পশ্চিমে ‘কমিউনিকেশন’ সংক্রান্ত আলোচনার সূচনা হয় এরিস্টটলের হাত ধরে। তিনি ‘কমিউনিকেশন’-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে–

Communication is the means of persuation to influence the other, so that the desired effect is achieved (Kennedy, 2007)।

অর্থাৎ এরিস্টটলের মতে ‘কমিউনিকেশন’ হলো অন্য কাউকে প্রভাবিত করার কৌশল যার মাধ্যমে মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। সম্ভবত প্রজাতন্ত্রের জনগণকে

প্রভাবিত বা শাসনের উদ্দেশ্য থেকে এরিস্টটলের এই 'কমিউনিকেশন' সংক্রান্ত মনোভাবনার জন্ম।[৫] তবে পরবর্তীকালে 'কমিউনিকেশন'-কে আরো বিস্তৃত পরিসরে দেখার চেষ্টা হয়েছে। 'কমিউনিকেশন' শব্দের বুৎপত্তিগত দিক বিচার করলে দেখা যায় 'কমিউনিকেশন' লাতিন শব্দ 'Communicatio' (কমিউনিকেশিও) থেকে এসেছে। যার অর্থ, আদান-প্রদান/ প্রদায়ী। এর শব্দমূল হলো Communis (কমিউনিস) যা সাধারণ বা কখোনো কখোনো সাধারণ মানুষ বোঝায়। এটি আরেকটি লাতিন শব্দ 'Munus'-এর সাথে যুক্ত হয়, যার অর্থ দায়িত্ব বা দায়িত্ববোধ। এ দুটো শব্দ মিলে মূল যে শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় তা হলো, আদান-প্রদান, পরিবর্তন বা যা একের অধিক ব্যক্তির অধিকারে আছে এমন কিছুকে বোঝায়। আবার একদল তাত্ত্বিক মনে করেন communication শব্দটি communicare শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ (কোনকিছু) 'সাধারণ করে ফেলা' (Peters, 2008)।

একবিংশ শতকে এসে ডেভিড কে. বারলো, শ্র্যামের মতো যোগাযোগবিদরা কম-বেশি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'কমিউনিকেশন'কে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যতম শক্তিশালী তাত্ত্বিক ডেভিড কে বারলো 'কমিউনিকেশন'-কে দেখেছেন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে যেখানে প্রেরক ও প্রাপক পরস্পরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন, অতঃপর একটি সাধারণ ধারণায় উপনীত হন এবং এর মাধ্যমে তারা উভয়ই উপকৃত হন (Berlo, 1960)।

'কমিউনিকেশন'-কে প্রায় একইভাবে দেখেছেন 'কমিউনিকেশন'-এর অন্যতম প্রভাবশালী তাত্ত্বিক উইলব্যার শ্র্যামও। তিনি একে অনেকটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ারূপে দেখেছেন (Schramm, 1954)। এই একই যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে 'কমিউনিকেশন'কে দেখেছেন শ্যানন ওয়েভারসহ বেশিরভাগ পশ্চিমা 'কমিউনিকেশন'-তাত্ত্বিক (Schramm, 1954)। এ সকল তাত্ত্বিকদের আলোচনা থেকে 'কমিউনিকেশন' সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হলো: 'কমিউনিকেশন' একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া (অনেকটাই যান্ত্রিক) (শ্র্যাম, শ্যানন উইভার), যাতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সম্পৃক্ত থাকেন। যেখানে বার্তা প্রেরকের কাছ থেকে সংকেতবদ্ধ হয়ে শব্দাকারে প্রাপকের কাছে পৌঁছায়। প্রাপক শব্দকে সংকেতমুক্ত করে গ্রহণ করেন এবং পরে ফলাবর্তন আকারে তা আবার প্রেরকের কাছে পৌঁছে দেন। এভাবে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, ভাব, মতামত, অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটি ঐক্যমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। এই ঐক্যমত্য ইতিবাচক বা নেতিবাচক দুটোই হতে পারে।

---

[৫] এরিস্টটলের সময় প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলো যেমন এথেন্সে শাসনব্যবস্থা ছিলো প্রজাতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। সেসময় সেখানে আদালত ইত্যাদিতে নিজ পক্ষে সিদ্ধান্ত আদায়ের জন্য বক্তৃতা ও প্রভাব বিস্তার করা অপরিহার্য ছিলো। কিভাবে এই প্রভাব রাখা বা বাড়ানো যায় তার কৌশল জানাও একই কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তাই এরিস্টটল মনে করতেন কমিউনিকেশন (বা রেটোরিক) হলো সেই কৌশল যার মাধ্যমে জনসাধারণকে রাজি করানো বা শাসন করা সম্ভব। তিনি তার রেটোরিকে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন (Aristotle, Rhetoric, Book I, Chapter 2)

অনেক সময় এই বার্তা প্রবাহের মধ্যে বিবিধ বিঘ্ন থাকে, যার ফলে বার্তা সঠিকভাবে আদান-প্রাদানে নানারকম বাধা তৈরি হয় (Devito, 2007)। এই বিঘ্ন হতে পারে ভাষাগত, পরিবেশগত, স্থানিক, মনোঃস্তাত্ত্বিক কিংবা সাংস্কৃতিক। ফলপ্রসূ যোগাযোগ পেতে হলে ব্যক্তিকে এই বিঘ্ন অতিক্রম করে যেতে হয়, বা বিঘ্নকে দূর করতে হয়। কমিউনিকেশন অধ্যয়নে এই বিঘ্নকে এড়ানোর নানা উপায়ের কথা বলা আছে। এছাড়াও কমিউনিকেশনের ধরন বর্ণনায় অন্তঃব্যক্তিক, আন্তঃব্যক্তিক. দ্বিতয়ী, গণ, দলীয়, সাংগঠনিক ইত্যাদি নানারকম ধরনের কথা বলা হয়েছে (Devito, 2007)।

এই কমিউনিকেশনের সবচেয়ে বুনিয়াদি রূপ হচ্ছে 'হিউমেন কমিউনিকেশন', যার বাংলা করা হয়েছে 'মানবীয় যোগাযোগ'। মূলত বহিঃবিশ্বের প্রতীকী আচরণের প্রতি ব্যক্তির সাড়া প্রদানের প্রাক্রিয়াকে মানবীয় যোগাযোগ বলা হয়েছে (Adler, Rodman & du Pré, 2019)। অর্থাৎ 'কমিউনিকেশন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, নতুন ভাব বা অনুভূতি যুক্ত হবে, ব্যক্তিও নিজের অভিজ্ঞতা, মনোভাব অপরের কাছে পৌঁছে দিবে। পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের কমিউনিকেশন সংক্রান্ত বেশিরভাগ আলোচনা এই আদান-প্রদান কতটা সুচারুরূপে করা যায়, তার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধিপত্য বিস্তারকারী জ্ঞানচর্চা হিসেবে 'কমিউনিকেশন'-এর এই পশ্চিমা রূপ 'যোগাযোগ' সংক্রান্ত জ্ঞানচর্চার ভিত্তিরূপে সমগ্র বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে যোগাযোগের স্বরূপ বিশ্লেষণঃ

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় ভারতীয় বিদ্যায়তনে যোগাযোগ অধ্যায়ন বেশ গুরুত্বের সাথেই করা হয়েছিলো। এবং এ অঞ্চলের বিভিন্ন ধারার বিদ্যাচর্চায় যোগাযোগের একটি পৃথক ধারাকে বেশ ভালোভাবেই সনাক্ত করা যায়।

ভারতীয় 'যোগাযোগ ধারণা'

পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তাঃ

দর্শন ও জ্ঞান চর্চায় সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ভারতে এখন পর্যন্ত মানুষের সবচেয়ে মৌলিক এই আচরণকে, পশ্চিমা সংজ্ঞায়নেই বিবেচনা করা হয়েছে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ভিন্ন জল-হাওয়ার গাছ যেমন দেশি মাটিতে শিকড় বিস্তৃত করে টিকে থাকতে পারে না তেমনি বিদেশি ভাব বোধগম্যতা দিয়েও অন্তরের চাহিদা বোঝা বা মেটানো যায় না, শব্দার্থবিদ কলিম খানের[৬] এই যৌক্তিক প্রেক্ষাপট থেকে এবং সমাজের নানানরকম বিশৃঙ্খলার কারণ অনুসন্ধান কিংবা অনেক অধরা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার তাগিদ থেকে যোগাযোগকে পশ্চিমের পরিপ্রেক্ষিত থেকে নয় বরং নিজেদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য কিংবা জ্ঞানচর্চার আলোকে বোঝা জরুরি।

[৬] কলিম খানের বঙ্গীয় শব্দার্থকোষের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য

ভারতে জ্ঞানচর্চার গতি-প্রকৃতি:

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন, জ্ঞান চর্চার আদি ক্ষেত্র এই ভারতীয় সভ্যতায় জ্ঞান চর্চা হয়েছে পশ্চিম থেকে অনেকটাই ভিন্ন পথে (Chattopadhyaya, 2020)। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভারতীয় দর্শন বইতে ঝা'র বরাত দিয়ে বলেছেন পশ্চিমের জ্ঞান দর্শনের জন্ম হয়েছে বিস্ময় বা তার মনে উদয় হওয়া প্রশ্ন থেকে কিন্তু ভারতে জ্ঞান চর্চা হয়েছে মানুষের জীবনের নৈতিক এবং ঐহিক পীড়া থেকে বা তার অস্তিত্বকে বোঝা বা টিকিয়ে রাখার বাস্তব প্রয়োজনের চাপ থেকে (Chattopadhyaya, 2020)। এখানে মানুষ প্রতিনিয়ত তার অস্তিত্বকে খুঁজে না পাওয়ার যন্ত্রণায় ভুগেছে। বাস্তবতা ও মনের নানান বৈপরীত্যের কারণে মানুষ যে গ্লানির মুখোমুখি হয়, সেই গ্লানি কী করে দূর করা যায়, কিভাবে মনে উদয় হওয়া প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়, তা এ ভূখণ্ডের মানুষকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত ও পীড়িত করেছিলো। এবং এ পীড়া বা বেদনা তাকে প্রতিনিয়ত সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত রেখেছিলো। এই ধারাবাহিক জ্ঞান চর্চায় ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। জ্ঞানচর্চার এই সুদীর্ঘ পথে, বিভিন্ন সময়ে যুক্ত প্রায় সব সম্প্রদায়ই, মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ এই প্রশ্ন অনুসন্ধানের সর্বশেষ ধাপকে বলেছেন 'মোক্ষ', যা এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে কোন না কোন অর্থে এই গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় (Chattopadhyaya, 2020)।

ভারতীয় দর্শন মতে মানুষের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য এই মোক্ষ লাভ। যার জন্যই, মানুষ নানাবিধ কর্মে যুক্ত হয়। এই নানাবিধ যেসব কর্মে মানুষ প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে এগুলোই মানুষের মৌলিক মানবীয় ধর্ম। মানুষ তার ধর্ম তাগিদ থেকে জগতের বিভিন্ন প্রাণ-পরিবেশের সাথে সখ্যতা তৈরি করে এবং এ প্রক্রিয়ায় মোক্ষ লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে।

ভারতীয় জ্ঞানর্চচায় 'যোগাযোগ ধারণা'

ভারতীয় জ্ঞানচর্চার পথ যেহেতু পশ্চিমা জ্ঞানচর্চা থেকে অনেকটা আলাদা, সেক্ষেত্রে এখানে জন্ম নেওয়া জ্ঞান, পশ্চিম থেকে ভিন্ন হবে তা ধরে নেওয়া যায়। যোগাযোগের মতো মৌলিক মানবীয় কর্মকাণ্ড এবং এ কর্মকাণ্ড যে বিদ্যার আশ্রয়ে গড়ে উঠেছিলো, তার স্বরূপ বা বিকাশের পথ খুঁজে দেখা তাই স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহল। পাশাপাশি এ অঞ্চলের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য ও প্রবণতা বিচার করলে যোগাযোগকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করারও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

ভারতীয় শিক্ষা-পর্যেষণায় যোগাযোগ সংক্রান্ত আলোচনা আমরা খুঁজে পাই খৃস্টের জন্মেরও প্রায় হাজার বছর আগে থেকে। ইতিহাসের দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোত্র কিংবা গোত্রোত্তীর্ণ ব্যক্তিদের দেওয়া দার্শনিক আলোচনায় এই মানবীয় ক্রিয়ার সরব উপস্থিতি,

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এই ক্রিয়ার ভাবের গভীরতা এবং এর দার্শনিক উপযোগীতার কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। [৭]

যোগাযোগ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ

বাংলা বেশিরভাগ পাঠ-আলোচনায় ‘কমডিনিকেশন’-এর অনুবাদ ‘যোগাযোগ’ হলেও কোন কোন জায়গায় একে ‘সংযোগ’ নামেও অভিহিত করা হয়েছে[৮] (Panini, 5th–4th century BCE)। ‘সংযোগ’ বা ‘যোগাযোগ’ শব্দের মূল ধাতু হিসেবে ‘যোগ’কে বর্ণনা করেছেন ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থ বিজ্ঞানের প্রবক্তা কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী (২০১১)। তাঁদের ‘বঙ্গীয় শব্দার্থ কোষ’-এ ‘যোগ’-এর মূল ধাতু হিসেবে ‘যুজ’কে চিহ্নিত করে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ‘নবরূপী যাতার জনন যাতে’। অর্থাৎ যে প্রতিবার নতুন রূপে জন্ম নেয়। অর্থাৎ যে কর্মে মানুষ প্রতিনিয়ত জন্ম নেয় এবং জন্মানোর এ প্রক্রিয়া চলমান থাকে তাই যোগ। এর সাথে ‘যোগা’ যুক্ত হয়ে ‘যোগাযোগ’ শব্দ তৈরি হয়েছে। ‘যোগা’ শব্দের অর্থ যুক্ত করা বা লাগানো। যোগাযোগের এ প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রতিনিয়তই নতুন জ্ঞানের মুখোমুখি হয় এবং নিজেকে নতুনরূপে আবিষ্কার করে। এভাবে মানুষ প্রতিনিয়ত নতুনভাবে জন্ম লাভ করে।

হরিচরণ (২০১১) কিংবা কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর (২০১১) অভিধানে ‘যোগ’-এর আরো যে বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, সেগুলো হচ্ছেঃ যোজন, সম্মিলন, যুক্তকরণ ও সম্ভাবনা।

‘যোগ’ শব্দমূলের আরো বেশ কয়েকটি অর্থ আমরা খুঁজে পাই বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি ও সাহিত্যে। বিশেষ করে বেদ, উপনিষদ এবং পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহে ‘যোগ’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য ‘যোগ’ শব্দ সবক্ষেত্রে সব সময় একই অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। তবুও এই ‘যোগ’ ও ‘যোগাযোগে’র মূলশব্দ ‘যোগ’-এর মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি না তা বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝে দেখা দরকার।

‘যোগ’ শব্দের উৎস সংস্কৃত ‘যুজ’ ধাতুর অর্থ নিয়ন্ত্রণ করা, বা যুক্ত করা বা ঐক্যবদ্ধ করাও বোঝায় । ‘যুজির্সমাধৌ’ শব্দ থেকে যুজ বা ‘যোগ’ শব্দ এসেছে, যার অর্থ চিন্তন বা চিন্তার

[৭] যদিও এই ভাব বোঝাতে সবসময় কেবল ‘যোগাযোগ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। আবার ভারতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুসারে এ শব্দ পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন অর্থ ধারণ করেছে। আবার কখোনো কখোনো ভিন্ন আরেকটি শব্দ দিয়েও এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। তবে যে নামই দেয়ো হোক না কেনো, ব্যক্তির নিজের সাথে নিজের কিংবা নিজের সঙ্গে সৃষ্টির অপরাপর এককের সম্বন্ধ স্থাপনের এই মানবীয় কর্মকাণ্ডকে প্রাচীন ভারতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দর্শন ও সাহিত্যে বেশ গুরুত্বের সাথেই যে আলোচনা করা হয়েছে তার প্রমাণ আমরা প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে দেখতে পাই।

[৮] পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী (খৃষ্টপূর্ব ৫ম-৪থ শতক) ব্যাকরণে ধ্বনিগত ও ব্যাকরণিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সংযোগ শব্দটি ব্যবহার করেন। যোগসূত্রে পতঞ্জলী আত্মা ও প্রকৃতির মিলন বোঝাতে সংযোগ শব্দ ব্যবহার করেন। বাংলা একাডেমির অভিধানেও সংযোগ শব্দটি কমিউনিকেশনের অর্থ হিসেবে উল্লেখ করা আছে।

সম্মিলন। দ্বৈতবাদী রাজযোগের ক্ষেত্রে এই অনুবাদ তাৎপর্যময়। কারণ রাজযোগ অনুসারে 'যোগ' হচ্ছে চিন্তার প্রক্রিয়া (Vivekananda, 1896)।

সাংখ্যবাদে বলা হয়েছে, 'যোগ' পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সঠিক ভেদ বিচার করে জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, এখানে পুরুষ অর্থাৎ যে কাজের নিয়ন্ত্রক (মেল বা পুরুষবাচক অর্থে না) এবং প্রকৃতি যাকে পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত, মানুষ এ পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পৃথিবীকে জানার হাতিয়ার হিসেবে 'যোগ'কে ব্যবহার করে (সাংখ্যবাদ-হিন্দুবাদ)। এ অর্থ থেকে 'যোগ' শব্দের সাথে 'কমিউনিকেশন' এর বাংলা যে 'যোগাযোগ' বা 'সংযোগ' তার সম্বন্ধ আছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

তবে সংস্কৃত ও ভারতীয় প্রাচীন দর্শন চর্চায় ভিন্ন সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের এই ক্রিয়া বোঝাতে কাছাকাছি আরো একটি শব্দ আমরা খুঁজে পাই। তা হলো- 'সঞ্চার' (Adhikary, 2010a)। 'সঞ্চার' শব্দের অর্থ আধুনিক 'যোগাযোগ' বা 'কমিউনিকেশন'-এর সাথে অনেকটাই মিলে যায়। সংস্কৃতি ভাষা থেকে জন্ম নেয়া অনেক ভাষা যেমন হিন্দি, বাংলা, নেপালি ইত্যাদিতে এই 'সঞ্চার' শব্দ দেখতে পাওয়া যায়।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন সাহিত্যেও 'সঞ্চার' শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। সংস্কৃতিতে যদিও সঞ্চারের অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত থেকে জন্ম নেয়া অধিকাংশ ভাষাতেই 'সঞ্চার' শব্দ দিয়ে বার্তা বহন করা বোঝায়। প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান থেকে জানা যায়, সমগোত্রীয় অর্থাৎ একই সংস্কৃতির, একই গোত্রের, একই দার্শনিক মতাদর্শ বা একই জাতির মানুষের মধ্যে সাধারণ/একইরকম (Common) বোঝাপড়া তৈরির পথই হলো 'সঞ্চার'। 'সঞ্চারে'র সাথে 'যোগ' শব্দ যুক্ত হয়ে গঠিত হওয়া 'সঞ্চার-যোগ', আধুনিক 'যোগাযোগ' প্রক্রিয়ার অনেক জিজ্ঞাসাকে পূরণ করতে পারে, এমন কি অধিক ব্যাখ্যাও দিতে পারে (Adhikari, 2010)।

যোগের ব্যুৎপত্তিগত আলোচনায় এ পর্যন্ত যা দাঁড়ালো, 'যোগাযোগ' মানে প্রথমত যোগ বা চিন্তন প্রক্রিয়াকে একত্রিত করা। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতি ও কর্তার সম্পর্ক বোঝার মাধ্যমে জগৎ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া এবং তৃতীয়ত ধারাবাহিকভাবে এ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিনিয়ত প্রাণময় রাখা।

যোগ দর্শনে 'যোগাযোগ'র স্বরূপঃ

মূলত গত শতকের অষ্টম ও নবম দশক থেকে 'কমিউনিকেশন'-কে ভারতীয় প্রেক্ষাপট থেকে বুঝতে চাওয়ার প্রয়াস শুরু হয়।[৯] প্রথমেই বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনে 'যোগ' কিভাবে এসেছে তা মিলিয়ে দেখা যাক।

'যোগ' শব্দটিকে সন্ধান করলে প্রথমে যে প্রাচীন দর্শনের কথা মনে হয়, তা হলো 'যোগ দর্শন'। প্রাচীন ভারতীয় ছয়টি প্রধান আস্তিক্যবাদী দর্শনের অন্যতম হলো এই 'যোগ দর্শন'। মহর্ষি পতঞ্জলী এ দর্শনের রূপকার। এটি ভারতীয় নয়টি প্রভাবশালী দর্শনের মধ্যে অন্যতম। 'যোগসূত্র' বা 'পাতঞ্জলসূত্র' এই দর্শনের মূল বা সূত্রগ্রন্থ। মহর্ষি পতঞ্জলির নাম অনুসারে এই দর্শনকে পাতঞ্জল-দর্শনও বলা হয়। এই 'যোগ দর্শনে'র সাথে বর্তমানে আলোচ্য 'যোগ' শব্দের কোন সম্পর্ক আছে কি না তা অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক।

পতঞ্জলী দর্শনের মূল সুর হলো, পৃথিবীতে মানুষের জীবন স্পন্দন শুরুর পরের ক্ষণ থেকেই পৃথিবীর সাথে তার 'যোগ' প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, বিভিন্ন প্রয়োজনে, কোন জ্ঞান, তথ্য, অভিজ্ঞতা পাওয়ার জন্য, সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় খোঁজা কিংবা নিছক আনন্দ লাভের জন্য মানুষ প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

['তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্' (Tadā draṣṭuḥ svarūpe avasthānam) –যোগসূত্র ১.৩]

বাইরে থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি আত্মসাক্ষাতকারের বিষয়ও এ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ এক অনুষঙ্গ। পতঞ্জলী-দর্শন অনুসারে 'যোগ' মানে আদির সংগে অন্তের 'যোগ', বৃহতের সঙ্গে ক্ষুদ্রের 'যোগ', জীবাত্মার সংগে পরমাত্মার 'যোগ'।

মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগসূত্র' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রে যোগ-দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে 'যোগ' মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

['যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' (Yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ) –যোগসূত্র ১.২]

চিত্তের অর্থ এখানে ব্যাপক। পতঞ্জলী অনুসারে মানুষের মন, তার বুদ্ধি ও অহংকার –এই তিন মিলে তৈরি হয় চিত্ত। মন বা চিত্তের কোন রূপ গ্রহণকেই বলা হয় চিত্তের বৃত্তি। এই

---

[৯] কে এল যাদব সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতের জাতভেদ ব্যবস্থা, গ্রামীন সমাজ, পারিবারিক বন্ধন এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুশাসনের সাথে 'কমিউনিকেশনের' সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন এবং তিনি পশ্চিমা মডেলের (সেন্ডার–রিসিভার মডেল) কাঠামোকে সরলীকৃত উল্লেখ করে ভারতের জটিল সমাজব্যবস্থার জন্য তা যথেষ্ট নয় বলে দেখান। (Yadav, K. L. (1987). *Communication and Social Structure: An Indian Perspective)*
আইপি তিওয়ারি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সত্য অনুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে যোগাযোগ কিভাবে ভূমিকা রাখে, তা আলোচনা করেন এবং এ যোগাযোগের স্বরূপ পশ্চিমা মডেলে থাকে না বলে উল্লেখ করেন। (Tiwari, I. P. (1980). *Communication and Culture: An Indian Approach*

তিনের সামূহিক অর্থে এবং এই তিনটিকে বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে অর্থাৎ বিপথগামী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করাই যোগের উদ্দেশ্য বলে পতঞ্জলী বলে গেছেন (পতজ্ঞলী যোগশাস্ত্র) (Patanjali, c. 2nd century BCE)।

যোগশাস্ত্র বলে, এই 'যোগ' ক্রিয়ায় যে কোন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। এটি জাগতিক নানান সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় খুঁজে পেতে, নিজের কষ্টের বা দুঃখের অবসান করতে কিংবা আনন্দ পাওয়ার বা সুখী হওয়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এটাই 'যোগে'র মূল কাজ। এ শাস্ত্র বলে, মানুষের মন তার সকল সৃষ্টির ভরকেন্দ্র, আর এই ভরকেন্দ্রকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে পারলেই জগৎ-সংসারে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা তৈরি করা সম্ভব। 'যোগ' এই ভারসাম্য তৈরিতেই সাহায্য করে। অর্থাৎ এটি মানবীয় কর্মকাণ্ডের এমন এক মৌলিক রূপ, যা মানুষকে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব তৈরি করতে পথ দেখায়।

এখানে 'যোগে'র সাথে যোগাযোগের একটা সম্পর্ক আছে বলে আমরা ধরে নিতেই পারি। 'যোগ' একদিকে যেমন প্রকৃতি ও পুরুষের সমন্বয়, অন্যদিকে 'যোগ' অনন্তের সাথেও মিলিত হওয়ার উপায়। এ কারণে যোগ এবং যোগ থেকে জন্ম নেয়া যোগাযোগ এক গভীর জীবন দর্শন।

পরবর্তী সময়ে শ্রী অরবিন্দ (১৯৯৯) এই 'যোগ'কে ব্যাখ্যা করেছেন একটি শক্তি হিসেবে যা এক আত্মার সাথে অন্যান্য আত্মার সম্মিলন ঘটায়। এটি এমন এক শক্তি যা মানুষের চেতনার অন্তরালে থাকে। যোগ হচ্ছে– প্রকৃতির শক্তি এবং প্রকৃতির উপাদানকে কাজে লাগিয়ে এর সাথে মানুষের বুদ্ধি, সামর্থ, জ্ঞানকে সমন্বিত করে এমন এক ক্ষমতা অর্জন করা যা বিশ্বকে এক করার জন্য চালিত করবে। অথবা নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি, আবেগ, অনুধাবনকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। 'যোগ' এমন এক প্রক্রিয়া যা চেতনকে অবচেতনের সাথে যুক্ত করে মানুষকে তার সামর্থের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে (Aurobindo, 1999)।

ভারতীয় এ দর্শনে 'যোগ' মূলত পরমাত্মার সাথে এক হওয়াকে বোঝায়। যার মূল লক্ষ্য মোক্ষ। মোক্ষ মানে মুক্তি। 'সঞ্চার'কেও মোক্ষ লাভের উপায় হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। আবার মোক্ষ শব্দ নিয়েও এখানে নানান মত লক্ষ করা যায়। সনাতন দর্শনে কোনো কোনো জায়গায় বিদ্যাকেই মোক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয়মতে মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যার অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুসন্ধান করা। এবং এই বিদ্যা লাভের জন্য সে 'যোগ', যোগাযোগ, 'সঞ্চার' কিংবা 'সঞ্চার-যোগে'র দ্বারস্থ হয় (Adhikary, 2012) ।

সুতরাং এ আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়, 'সঞ্চার' ও 'যোগাযোগ' মূলত একই অর্থ বহন করে বা সমার্থক শব্দ। অর্থাৎ আমরা ভারতীয় জ্ঞানচর্চায় ইংরেজি শব্দ 'কমিউনিকেশন'-এর অনুবাদ হিসেবে 'যোগাযোগ' ছাড়াও বেশ কয়েকটি শব্দ পাই, যা 'কমিউনিকেশন'-এর অর্থকেই প্রতিম্বিত করে। যেমন মূল শব্দ 'যোগ'-এর আগে 'সম'

শব্দমূল যুক্ত হলে 'সংযোগ' পাওয়া যায়, এছাড়া রয়েছে 'সঞ্চার', এবং দু'টো কাছাকাছি অর্থ ধারণকারী শব্দ যুক্ত করে নতুন প্রত্যয় 'সঞ্চার-যোগ'।

এখানে উল্লেখ্য, ঋগবেদে 'যোগাযোগ' ক্রিয়াকে আরেকটি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এ শব্দের ব্যবহার এবং গঠন দেখেও আমরা এর কাজ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। এটিও পৃথক সত্ত্বার সাথে যোগসূত্র তৈরি করা বোঝায়, শব্দটি হলো 'সহধারণ'। যা 'সহ' ও 'ধারণ' দু'টো শব্দমূল দিয়ে গঠিত। পরস্পরের সাথে সম্পর্ক তৈরি হলে বা সম্ভাব্য সম্পর্কিত দু'টো সত্ত্বার মধ্যে একই আবেগ, ভাবনা, তথ্য আদান-প্রদান হলে যে প্রক্রিয়ায় তা সংঘটিত হয় তাকে 'সহধারণ' বা 'সাধারণ' বলা হয় (Vatsyayan, 1996)।

তবে বর্তমান সময়ে 'যোগাযোগ'-কে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যাকারী যোগাযোগবিগণ (বিশেষ করে জে. এস. যাদব কিংবা আই পি তিওয়ারি) 'যোগাযোগ'-কে ব্যাখ্যা করার জন্য ভারতমুনির সাধারণীকরণ তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করেছেন। ঋগবেদে উল্লেখিত 'সাধারণ' বা 'সহধারণ' ভারতমুনির নাট্যশাস্ত্রে 'সাধারণীকরণ' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। সাধারণ শব্দের মতো সাধারণীকরণ শব্দের অর্থ হলো সহধারণ করার প্রক্রিয়া বা 'এক হওয়া' বা সাধারণ কোন অবস্থা তৈরি করা। খৃস্টিয় দশম শতকে ভট্টনায়কের গ্রন্থে প্রথম সাধারণীকরণ শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় (Vatsyayan, 1996)। ভট্টনায়ক মূলত একাধিক ব্যক্তির কোন বিষয়ে এক হওয়া বা সাধারণ ধারণায় পৌঁছানোর বিষয়কেই সাধারণীকরণ বলেছেন। তিনি মূলত যে বিষয়ের ওপর জোর দেন তা হলো, একাধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক এ যোগ অর্থাৎ তাদের 'এক হওয়া'-র ব্যাপার পরস্পরকে প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে ঘটে না, বরং পরস্পর একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার মাধ্যম উভয়ের হৃদয়ে এক ভাবের, একাত্মতার বিষয়টি জন্ম নেয়। এই একাত্ম হওয়ার বিষয়টি তারা উভয়েই উপভোগ করেন, এবং এভাবে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়তা তৈরি হয়। ভট্টনায়ক মূলত নাট্যশাস্ত্র'কে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমেই একাধিক ব্যক্তির 'এক হওয়া'র বিষয়টি তুলে আনেন। ভট্টনায়কের উদ্বৃতিতে 'একাত্ম হওয়ার' বা সাধারণীকরণ প্রসঙ্গটি প্রথম পাওয়া গেলেও এর উৎস খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের কোন এক সময়কালে রচিত ভারতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র'।

'নাট্যশাস্ত্রে' যোগাযোগ স্বরূপ

ভারতীয় দর্শনের অত্যন্ত প্রাচীন একটি গ্রন্থ এই 'নাট্যশাস্ত্রে' যোগাযোগ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া গেছে। নাটক ও অভিনয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা এ গ্রন্থে নাট্যমঞ্চের কলা-কুশলীরা কিভাবে তাদের মনের অনুভূতি সামনে বসা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, সে বিষয়ই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মঞ্চের কলাকুশলীগণ তাদের সামনে উপবিষ্ট দর্শকদের কাছে তাদের আভিনীত ভাব কিভাবে পৌঁছে দিবে, কিভাবে

দর্শকশ্রোতা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বলা গল্পকে বুঝতে পারবেন, সে বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে ভারত মুনি 'যোগাযোগ'-এর একেবারে মূল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও তিনি এ পুরো প্রক্রিয়াকে বলেছেন সাধারণীকরণ বা একাত্ম হওয়ার প্রক্রিয়া। তার এ আলোচনায় রসতত্ত্ব, সহৃদয়তার ধারণাসহ যোগাযোগের বেশ কিছু মৌলিক বিষয় উঠে আসে।

রসতত্ত্ব

ভারত মুনি তাঁর এই বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্রে এক পক্ষের আবেগ, বার্তা, অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা অপর পক্ষে সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সুচারু রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সঞ্চারক এবং গ্রহণকারীর মধ্যে সঞ্চারিত ভাব এবং বার্তাপ্রবাহের সফলতার উপর জোর দিয়েছেন। এই সফল ভাব বিনিময়কে তিনি নাম দিয়েছেন 'রসতত্ত্ব'। রসতত্ত্ব অনুসারে সফল রসাস্বাদনের মাধ্যমে দুজন ব্যক্তির কোন বিষয় সহধারণ করা সম্ভব (Muni & Ghosh, 1951)।

ভাব থেকেই রসের উৎপত্তি। ভারতমুনি তাঁর শাস্ত্রে যে বিষয়টির ওপর জোর দেন তা হলো মঞ্চের মতো একটি জায়গায় অভিনেতা বা প্রদর্শক তার ভাব সঞ্চারণ কৌশল বা যোগাযোগ দক্ষতার মাধ্যমে সামনে উপবিষ্ট দর্শক-শ্রোতার মনে তার বক্তব্য বা ভাবকে সঞ্চারিত করেন। এই সঞ্চারে সফলতা পাওয়া যায় তখনই যখন সামনের ব্যক্তি এই ভাব নিজের মধ্যে অনুধাবন করতে পারেন। এর নামই রসাস্বাদন (Muni & Ghosh, 1951)।

সহৃদয়তার ধারণা

ভারতমুনির নাট্যশাস্ত্রে সফল বার্তা সঞ্চারণ এবং অভিন্নতার পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের কথা উঠে এসেছে, তা হলো– সহৃদয়তা। প্রাচ্যীয় যে কোন সম্পর্ক তৈরির মূলমন্ত্রই হচ্ছে সহৃদয়তার সম্বন্ধ স্থাপন। এখানে সকল 'যোগাযোগে'র অন্যতম লক্ষ্যও তাই। এখানে 'স' অর্থ সম, 'হৃদয়' অর্থ মন। দুয়ে মিলে সহৃদয় অর্থ দাঁড়ায় সম-মন। অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তির হৃদয় এক হয়ে যাওয়া এবং তাদের মধ্যে একটি একভাব বা সমমনা ভাব তৈরি হওয়া। সফল ভাবের আদান-প্রদানে দু'জনের হৃদয় প্রকৃষ্টরূপে যুক্ত হলে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তৈরি হয় তাই সহৃদয়তা। প্রাচ্যের প্রায় সকল দর্শনে এই সহৃদয়তার বন্ধনেই মানবজীবনের মুক্তির কথা বলা হয়েছে। সহৃদয়তা তৈরি সক্রিয়ক বা কর্তার শব্দ ব্যবহার এবং বার্তা সঞ্চারিত হওয়ার ওপরে অনেক খানিই নির্ভর করে। ভারতের যে কোন শাস্ত্র শব্দের ওপরেই টিকে থাকে, তাই এখানে শব্দের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নাই।

নাট্যশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারতমুনি আসলে 'যোগাযোগ'-এর মূল বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন মঞ্চে অভিনেতা প্রবেশের সাথে সাথেই দর্শকের কাছে দু'টি ভাবের সঞ্চার হয়। একটি হলো, অভিনেতার বাহ্যিক রূপ ও তার আভূষণ আরেকটি হলো তার মুখ নিঃসৃত

শব্দ। অভিনেতার বাহ্যিক রূপ অর্থাৎ তার সাজ এবং মুখের ভাব দেখলেই দর্শক নাটকে তার ভূমিকা সম্পর্কে আগেই একটা ধারণা পেয়ে যায়, এবং পরে সংলাপে সেই অনুমান করা চরিত্রকে মিলিয়ে নেয়। নাট্যশাস্ত্রে ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের আবেগ, আবেগে মুখের ভাব তৈরী ও এর অর্থ, কুশলীর পোষাক, রঙ এসব নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে।

মঞ্চের বিষয়কে যদি দৈনন্দিন ক্রিয়ার অংশ করে দেখা হয়, তবে দেখা যায়, ব্যক্তি যখন অন্য কারো সাথে কোন সম্পর্ক স্থাপন করে বা ভাব আদান-প্রাদান করা অব্যাহত রাখে তখন তার মুখ নিঃসৃত শব্দের পাশাপাশি তার মুখের ভাব বা আভূষণ সে সঞ্চারক্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে ওঠে। এভাবে সেই ব্যক্তি বাচনিক বা অবাচনিক ভাব-রস সঞ্চারের মাধ্যমে অপর ব্যক্তির সাথে সহৃদয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে। এভাবে পুরো জগৎ সংসারে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে সহৃদয়তার সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে মোক্ষ বা মহামুক্তির পথে এগিয়ে যায়।

বৌদ্ধ ও সমসাময়িক অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্য-দর্শনে যোগাযোগ

সংস্কৃতের পর পালি সাহিত্যেও আমরা 'সঞ্চারযোগ' বা 'যোগাযোগ' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাই। পালি সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বৌদ্ধ-দর্শন। বৌদ্ধ-দর্শনের প্রবক্তা সিদ্ধার্থ গৌতম, যিনি বুদ্ধ নামেই অধিক পরিচিত, তার শিক্ষণ প্রণালীতে সৃষ্টির প্রতিটা অংশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়কে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। এবং এ বিষয়ে নানান দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিভাবে মানুষ অপর সৃষ্টির সাথে সম্বন্ধ গড়ে তুলবে, পৃথিবীর সমস্ত জাগতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিবে এবং নিজেকে সমগ্র সৃষ্টির একটি অংশ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিকে একটি এককে পরিণত করবে, সে বিষয়ে পথ দেখিয়ে গেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন পীটকে এর প্রমাণ দেখা যায়।

বৌদ্ধমতে যোগাযোগে, যোগাযোগ-গ্রহীতা সব সময় কেন্দ্রে থাকেন। আর এখানেই প্রাচ্যীয় যোগযোগ-দর্শন, পশ্চিমা যোগাযোগ-দর্শন থেকে ভিন্ন। অহিংসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, প্রাণ ও প্রকৃতির প্রতি স্নেহশীল হওয়া, এবং মানুষের আত্মিক সমতার প্রতি বিশ্বাসী থাকাই মনুষ্যত্বের ধর্ম। এই দর্শনেও মানব জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে মোক্ষ লাভের কথাই বলা হয়েছে।

বৌদ্ধদর্শনে আন্তঃযোগাযোগ এবং অন্তঃযোগাযোগকে আলাদা করে দেখা হয়নি বরং এরা পরস্পর সম্পর্কিত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি এবং তার আত্মার প্রতিফলন তার আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখে। আর মানুষের অন্তর্দৃষ্টি এবং তার অনুধাবন ক্ষমতা আসে তার পর্যবেক্ষণের গভীরতা এবং সমানুভূতিক চিন্তা, বা আত্মিক ভাবনা থেকে। এই ভাবই তার বাচনিক যোগাযোগে ফুটে ওঠে। তাই বাচনিক যোগাযোগ যে পুরোপুরি অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল তা বলাই বাহুল্য।

তবে বৌদ্ধ দর্শনে অন্তঃ, আন্তঃ এবং সামাজিক যোগাযোগকে সেভাবে আলাদা করে দেখা হয়নি। বুদ্ধ মতে, মানুষের যোগাযোগের অন্যতম বাহন তার ভাষা। এই ভাষা সে কিভাবে ব্যবহার করবে, কিভাবে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, সেটিই তার মুক্তির পথকে বিনির্মাণ করেবে (Roy and Narula, 2017) বৌদ্ধিক যোগাযোগে ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে অনেকটা জায়গা জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধিক যোগাযোগ প্রভাবিতকরণে নয় বরং পরস্পরের বোঝাপড়া, সহানুভূতি তৈরি হওয়ার প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়। এ দর্শনে যোগাযোগের মূল বিষয় হলো– 'হয় তুমি আমার পক্ষে আসবে নয় আমি তোমার সাথে যাবো' এ দুয়ের মাঝামাঝি আর কিছু নেই এবং যতক্ষণ ঐকমত্য তৈরী না হচ্ছে ততক্ষণ কথোপকথন চলতে থাকবে।

বুদ্ধবাদ এবং তাওবাদী মতবাদে মানুষের অন্তর্জ্ঞান সৃষ্টি, তার সৃষ্টিশীলতার বিকাশ, এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তৈরীর পিছনে মৌনতার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে। বাকযন্ত্রকে ব্যবহার করে মানুষ যেমন তার ভাব বচনে সঞ্চার করে একইভাবে মানুষের মনও নীরবতা মেনে তার অন্তরের ভাব সঞ্চয় করে রাখে।[১০]

বুদ্ধদর্শনের পাশাপাশি জৈনদর্শনেও যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিশেষ করে মৌনতা নিয়ে এই দর্শনে কিছু পাঠ-আলোচনা আছে। কিন্তু পর্যাপ্ত সাহিত্যের অভাবে এ দর্শনে যোগাযোগ বিষয়ে খুব বেশি তথ্য এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

জৈনদর্শনের দ্বিতীয় সূত্রস্কন্ধে মহাবীরের জীবনাচরণ আলোচনার পাশাপাশি মানুষের সাথে যোগাযোগের আচরণ কী হবে তার বিস্তারিত উল্লেখ আছে। আচারাংগা সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়

[10] **মৌনতার ধারণা**

মৌনতা প্রাচ্যীয় যোগাযোগের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখানে মৌনতা বা নীরবতা কেবল একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থান নয় বরং যোগাযোগের একটি বিশেষ কৌশল। এই নীরবতাই অন্তর্জ্ঞান উজ্জীবিত করে। বিশেষ করে বুদ্ধবাদ এবং তাওবাদী মতবাদে বলা হয়েছে মানুষের অন্তর্জ্ঞান সৃষ্টি, তার সৃষ্টিশীলতার বিকাশ, এবং আধ্যাত্মিক যে অভিজ্ঞতা তৈরী হয় এর পিছনে মৌনতার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। মানুষের মন কথা বলে। বাকযন্ত্রকে ব্যবহার করে মানুষ যেমন তার ভাব বচনে সঞ্চার করে একইভাবে মানুষের মনও তার অন্তরের ভাব সঞ্চয় করে রাখে। এই অন্তরের কথা তার বাহ্যিক বচন অপেক্ষা হাজারগুণ শক্তিশালী। মানুষ মুখে যা বলতে পারে না, তা সে তার নীরবতার মাধ্যমে বলে দিতে পারে। এই মৌনতা থেকে জন্ম নেয়া অন্তর্জ্ঞান তার মনে এক ধরনের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা তৈরি করে যা তাকে জ্ঞান-আলোকের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ সে নিজে জ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে কোন ব্যক্তিকে বা পরিস্থিতি বুঝে নিতে পারে, যা অনেক সময়ই বাচনিক আলাপের চেয়েও অনেক নির্ভরযোগ্য হয় (Isshi and Bruneau, 1994)। এ বিষয়কে আমরা বুঝতে পারবো যদি আমরা মনোচিকিৎসার দিকে একটু নজর দেই। এ চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তির সাথে কথায় যুক্ত হন কম বরং তার না বলা কথাগুলোর প্রতিই বেশি মনোযোগী হন। এবং এ ক্ষেত্রে তার নীরবতা, নীরবতা থেকে জন্ম নেয়া সমানুভূতি, অন্তর্জ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ তাকে পরিস্থিতি বুঝতে অনেক বেশি সহায়তা করে।

‘ভজত’-এ এই যোগাযোগ বিষয়ক আলোচনা খুঁজে পাওয়া যায়। আবেগ প্রকাশের ভাষা, বিশেষ করে ক্রোধ বা অন্যান্য অনুভূতি প্রকাশের সময় মানুষ কী ধরনের ভাষা প্রয়োগ করবে তার একটা পথ নির্দেশনা এখানে পাওয়া যায়। এটি যদিও কেবল জৈন সন্ন্যাসী-সন্নাসিনীদের জন্য এই নির্দেশনা ছিলো, তথাপি সকল মানুষের যোগাযোগের জন্য এটি জৈনদর্শনের বিশেষ নির্দেশনা বলে বিবেচিত হতে পারে।

জৈন-দর্শনে ভাষার ব্যকরণগত শুদ্ধতার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি এখানে যোগাযোগকারীর ভাষার স্পষ্টতা, যথার্থতা এবং তার কথা যেন তার শ্রোতার জন্য মধুর হয় অর্থাৎ সুভাষণের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। জৈন-দর্শনে যোগাযোগের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের চেয়ে বরং এর প্রায়োগিক দিকের ওপর নজর রাখা হয়েছে বেশি (Bhattacharyya & Loho Choudhury, 2016)।

সংশ্লেষঃ

এই নিবন্ধের বিচার্য ছিলো তিনটি বিষয়:

১. কমিউনিকেশনের বাংলা যোগাযোগ কতোটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা খতিয়ে দেখা;

২. কমিউনিকেশনের পশ্চিমা ধারণার সাথে ভারতের কমিউনিকেশন সংক্রান্ত ধারণার মিল-অমিল নিরীক্ষা করা;

৩. ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যোগাযোগ ধারণার রূপ উন্মোচন করা।

দেখা যাচ্ছে, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনে কমিউনিকেশন বিদ্যার সরব উপস্থিতি ছিলো। তবে ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ভিন্ন গতি প্রকৃতির কারণে এখানে জন্ম নেয়া বিদ্যা পশ্চিমে বিকশিত বিদ্যার থেকে নজরে পড়ার মতো পার্থক্য ধরে। ভারতীয় বিদ্যাচর্চার বিশেষত্ব হলো এখানে কোনো এক ভাব-ক্রিয়া বোঝাতে সব সময় এক নামশব্দ ব্যবহার করা হয়নি। পরিস্থিতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই অপরের সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের বিদ্যাকে এখানে যোগ, যোগাযোগ, সংযোগ, সঞ্চার, সঞ্চার-যোগ কখোনো সহ-ধারণ শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এ সব শব্দ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভাব প্রকাশ, সম্বন্ধ স্থাপন, চিন্তার সম্মিলন ইত্যাদি ক্রিয়া বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, যোগাযোগের যে বৃহৎ ব্যাপ্তি ও পরিসর কমিউনিকেশন শব্দ তা ধারণ করার উপযুক্ত না। অর্থাৎ খুব ছোট একটি ধারণা (কমিউনিকেশন)কে প্রকাশ করার জন্য খুবই বড় একটি ধারণা (যোগাযোগ)'কে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছেঃ যোগাযোগের বিশাল মানসভূমির কিয়দাংশ জুড়ে আছে পশ্চিমের কমিউনিকেশন বিদ্যা। ভারতীয় যোগাযোগ এক গভীর জীবনদর্শন। যা মানুষকে সৃষ্টির

সব প্রাণ-প্রকৃতিকে বুঝতে, তার সাথে নিজ জীবনের সম্বন্ধ গড়তে উৎসাহিত করে। এর মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য মোক্ষ লাভের চেষ্টা করে। জগতের সকল প্রাণের সঙ্গে নিজেকে গেঁথে নেওয়ার এ প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেকেও প্রকৃতির সৃষ্টি/অংশ বলে জানে, ফলত অপরাপর সব কিছুর সাথে সহৃদয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।

তৃতীয়তঃ কমিউনিকেশন বিদ্যায় সেন্ডার কমিউনিকেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্তা। কিন্তু ভারতীয় বিদ্যায় যোগাযোগে গ্রহীতা থাকেন যোগাযোগের কেন্দ্রে। সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উৎসকে তার গ্রহীতার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে যোগাযোগে অংশ নিতে হয়। সত্যবাদিতা, দয়াশীলতা, প্রয়োজনীয়তা এবং শান্তি কামনা এই চার উদ্দেশ্যেই মানুষ মুলত যোগাযোগে লিপ্ত হয় (বুদ্ধ বচন)। এখানে যোগাযোগে বার্তা, ভাব বা তথ্য আদান-প্রদানের যে কোন পর্যায়ে তাই সততা, অপরকে শ্রদ্ধা, দয়ার্দ্রতা এবং সদিচ্ছাকে সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে প্রভাবিতকরণ নয় বরং ঐক্যমতে আসার বিষয়ে অনেক বেশি জোর দেয়া হয়েছে।

ভারতে যোগাযোগ যতটা বহিঃস্থ তারচেয়ে বেশি অন্তঃস্থ বিষয়। এ কারণে এখানে মৌনতা বচনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভারতীয় মানুষ ধ্যান বা মৌনতার মাধ্যমেই অন্যকে বুঝতে পারে, তার অন্তরের অনুভূতিকে অনুভব করতে পারে। এভাবেই মানুষ সহৃদয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে জাগতিক সম্পর্কে নিজেকে সংযুক্ত করে।

উপসংহার

ভারতীয় উপমহাদেশ জ্ঞান ও দর্শন চর্চায় সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত টেক্সট বা নিদর্শনের অভাবে খুব বেশি তথ্য আমাদের কাছে নাই। এছাড়া ভারতীয় আদি জ্ঞানের যথাযথ সংরক্ষণ ও চর্চার অভাবে 'যোগাযোগ'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলোও আমাদের কাছে এখন অনেকটাই দুরহ ও দুর্বোধ্য হয়ে গেছে।

প্রাচ্যে 'যোগাযোগ' এবং পাশ্চাত্যের 'কমিউনিকেশন'-এর বয়ান ভিন্ন পথে বিকশিত হওয়ায় পাশ্চাত্য দর্শনের 'কমিউনিকেশন' সংক্রান্ত জ্ঞান প্রাচ্যের মানুষের জন্য কতটা কার্যকর তা নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে। পশ্চিমের অনেকটাই যান্ত্রিক, কার্যনির্ভর 'কমিউনিকেশন' জ্ঞান যেন এখানে উপরিভাগ বা বর্হিদেশের বিষয় হয়েই থেকে গেছে। প্রতিউত্তর, বিঘ্ন, বাচনিক-অবাচনিক যোগাযোগ, শারীরিক ভাষা, ইশারা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই পাশ্চাত্যের 'কমিউনিকেশন' আলোচনা ঘুরপাক খেয়েছে বেশি। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের আলোচনায়ও এ বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচ্যে 'যোগাযোগ' অনেকটাই অন্তঃস্থ বিষয়। এখানে 'যোগাযোগ' মানুষের জীবনদর্শনের সঙ্গে জড়িত। 'যোগাযোগ'কে মানুষ দেখেছে সমাজের সবচেয়ে মৌলিক একক বা প্রক্রিয়া হিসেবে, জগতের সকল প্রাণকে পরস্পর যুক্ত করার বন্ধনী বা সূত্র হিসেবে। পশ্চিম 'কমিউনিকেশন'-কে আধুনিক জ্ঞান হিসেবে পরিচয় করিয়ে

দেয়, সেখানে ‘যোগাযোগ’ প্রাচ্যে প্রতিটি মানুষ বংশানুক্রিকভাবে ধারণ করে। এ কারণে ভারতীয় ‘যোগাযোগ’ কেবল তথ্যের আদান-প্রদান নয় বরং এক গভীর অস্তিত্ববাদী জীবন অন্বেষণ প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে জগতের প্রতিটি প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়াস রাখে, আত্মিক সম্পর্ক তৈরী করতে চায়।

ভারতীয় দর্শন অনুসারে ‘যোগাযোগ’ সহৃদয়তার পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে মানুষের মুক্তি লাভের পথ নির্মাণ করে। এ মুক্তি মানে জাগতিক দায়িত্বের সমাপ্তি। অর্থাৎ এ জগৎ ও জীবনে মানুষের যা দায়িত্ব থাকে, সকলের সঙ্গে সহৃদয়তার সম্পর্ক তৈরি করে সমাজ-সংসারকে এগিয়ে নেওয়া- এটাই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য, এটাই তাদের কাছে মোক্ষ বা মুক্তি। ‘যোগাযোগ’ ওই লক্ষ্যে পৌঁছানোর অন্যতম হাতিয়ার। অন্তত প্রাচ্যে ‘যোগাযোগ’-কে এভাবেই দেখা হয়েছে।

Reference:

1. খান, কলিম, চক্রবর্তী, রবি, (২০১১), বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ভাষাবিন্যাস।
2. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, (২০২০), নবম সংস্করণ, ভারতীয় দর্শন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সিজ প্রা.লি।

৩. বন্দোপাধ্যায়, স, চক্রবর্তী, ছ (অনুবাদ), (১৯৫২-১৯৫৩), ভরত নাট্যশাস্ত্র ভলিউম ১, ২, নবপত্র প্রকাশক।

4. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, (২০১১), বঙ্গীয় শব্দকোষ, সাহিত্য একাডেমি।
5. Adhikary, N. M. (2008). The Sadharanikaran Model and Aristotle’s Model of Communication: A Comparative study. *Bodhi: An Interdisciplinary Journal*. https://doi.org/10.3126/bodhi.v2i1.2877
6. Adhikary, N., M. (2010a). Sancharyoga: approaching communication as a vidya in Hindu Orthodoxy. *China Media Research*, *6*(3).
7. Adhikary, N. M. (2010b). *Sahridayata* in communication. *Bodhi: An Interdisciplinary Journal*, *4*(1), 150–160. https://doi.org/10.3126/bodhi.v4i1.5816
8. Adler, R. B., Rodman, G. R., & DuPré, A. (2019). *Understanding human communication*. Oxford University Press, USA.
9. Arya, P. U., & Arya, U. (1985). *Philosophy of hatha Yoga*. Himalayan Institute Press.
10. Aurobindo, S. (2010). *The Synthesis of Yoga*. Sri Aurobindo Ashram Publications Department.
11. Berlo, D. K. (1960). *The process of communication: An Introduction to Theory and Practice*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
12. Bhattacharyya, K., & Lohochoudhury, B. (2016). Some Communication Thoughts in Jaina Philosophy. *Media Mimansa*, *10*, 9–16. https://www.researchgate.net/publication/319181471
13. Choudhary, B. L., & Bhattacharyya, K. K. (2014). Communication from Indian Perspective with Special Reference to Nātyashāstra. *Dev Sanskriti: Interdisciplinary International Journal*, *4*, 62–72. https://doi.org/10.36018/dsiij.v4i0.46
14. Dissanayake, W. (1988). Communication theory The Asian perspective. In *Asian Mass Communication Research and Information Centre eBooks*. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA13540682
15. Ishii, S., & Bruneau, T. (1994). Silence and silences in cross-cultural perspective: Japan and the United States. In L. A. Samovar & R. E. Porter (Eds.), Intercultural communication: A reader (pp. 246–251). Wadsworth.
16. Narula, S., & Roy, S. (2017). Alternative Views on the Theory of Communication: An Exploration through the Strands of Buddhism. *Journal of*

Mass Communication and Journalism, *07*(06). https://doi.org/10.4172/2165-7912.1000354

17. Peters, J. D. (2008). Communication: History of the idea. *The International Encyclopedia of Communication*. https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbiecc075
18. Samkhya- Hinduism. (2014). In *Encyclopedia Britannica*.
19. Shannon, C. E., & Weaver, W. (1963). *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.
20. Sinha, J. N. (1989). *An outline of Indian philosophy*. Current Distributors.
21. Vatsyayan, K. (1996). *Bharata, the Nā1996). .i*. Sahitya Akademi.
22. *Yoga Sutras of Patanjali | Internet Encyclopedia of Philosophy*. (n.d.). https://iep.utm.edu/yoga/
23. Yāska. (1998). *The Nighaṇṭu and the Nirukta: The oldest Indian treatise on etymology, philology, and semantics* (L. Sarup, Trans.). Motilal Banarsidass. (Original work published 1920–1927)